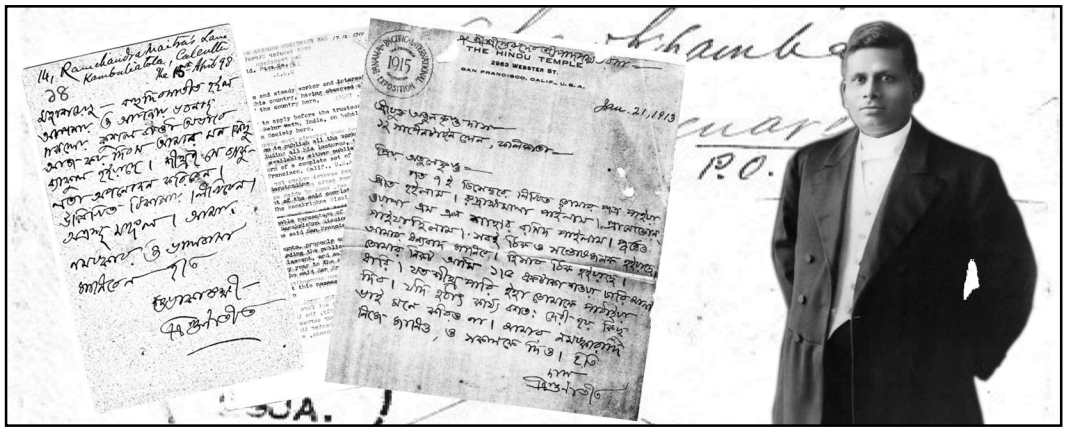

পত্রের আলোকে মজাদার স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

স্বামী ঋতানন্দ

মানবমনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন, মান-অভিমান, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তরঙ্গ মাধ্যম হল পত্র। পত্রের প্রতিটি শব্দ এক-একটি ভাববিন্দু। দূরে থেকেও পত্রের মাধ্যমে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দেওয়া যায়। আর তা যদি অতি অন্তরঙ্গ সুখ-দুঃখের সাথি, আত্মীয়, বন্ধু কিংবা সমমনোভাবাপন্ন ভাবগ্রাহী আত্মজনের কাছে লিখিত হয়, তবে তো আর কথাই নেই— কথা-ভাব-অনুভূতি সেখানে এমনই স্তরে উন্নীত হতে পারে যে, তা আর নির্দিষ্ট পত্রপ্রাপকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে না থেকে সর্বজনপাঠযোগ্য পত্রসাহিত্যে পরিণত হয়।

রসরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সদা আনন্দময়। শ্রীমা সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই সহজ সত্যটি অপরূপ ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন : ''তাঁকে কখনও বাপু নিরানন্দ দেখিনি, তা, পঞ্চাশ বছর বয়সের বুড়োর সঙ্গেই হোক, আর পাঁচ বছরের বালকের সঙ্গেই হোক।'' আর এই আনন্দময়তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল অনন্য সৃজনশীলতা এবং তা অবশ্যই মৌলিকত্বে ভরপুর। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসা মানুষেরা তাঁর আনন্দময়তার অভিব্যক্তিস্বরূপ তাল-লয়ে নিবদ্ধ নৃত্য ও সুমধুর সংগীত আস্বাদন করে তাদের চক্ষু-কর্ণকে সর্বোত্তমরূপে সার্থক করেছিল। আবার এসবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে উপস্থিত মানুষজনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-তামাশা, ফষ্টি-নষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে সংসারের বিচিত্র বিষয়গুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপিত করে তাদের মনকে আনন্দে উদ্বেল ও রসমধুর করে তুলতেন। রসরাজের রসবোধ বিচ্ছুরিত হত দিব্য ভাব-মধুর অঙ্গভঙ্গিমায় ও মাধুর্যময় কথকতাতেও। একদিনের কথা, এরকম ভাবের অত্যুচ্চ এক পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ফষ্টি-নষ্টিতে আপ্লুত তাঁর বালকভক্তেরা মেঝেতে পড়ে পাক খাচ্ছে আর তাদের একজন দুহাতে পেট চেপে ধরে বলছে : ''মশায়, আর বলবেন না, আরও বললে এবারে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে যাবে!''

শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দময়তার বহিঃপ্রকাশ তাঁর অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদদের জীবনেও স্বাভাবিকভাবেই সিঞ্চিত হয়েছিল। বৈদান্তিক ভাবে ভরপুর কঠোর-কঠিন, ত্যাগতপস্যাপূত সন্ন্যাসজীবনের মধ্যেও সরস, মজাদার ভাবরসে তাঁরা কীরকম সুস্নাত থাকতেন—তারই এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের সামান্য প্রয়াস বর্তমান নিবন্ধে। আমাদের আলোচ্য মানুষটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ওরফে সারদাপ্রসন্ন—শ্রীরামকৃষ্ণের এক অন্তরঙ্গ ত্যাগী সন্তান। ডাকাবুকো, নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা, কৃচ্ছ্রতাপরায়ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দিলখোলা, বন্ধুবৎসল, মানদায়ী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। বিচিত্র ও বহুবিধ গুণের অধিকারী মানুষটির মধ্যে নিয়ত 'বসত' করত আর এক মজাদার মানুষ। তাঁর মজারু মনোভাব, চটজলদি রস-রসিকতা, রসবোধ, রহস্য করার ক্ষমতা—সবকিছুতেই তিনি যেন 'বাপ কা বেটা'। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর এই রসবোধের চকিত চমকস্পর্শ শিবসম স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের গাম্ভীর্যের মেঘকে সরিয়ে দিয়ে বকুনির গমগমে পরিবেশে পর্যন্ত আনন্দ-বসন্তের সুপবন বইয়ে দিত। উদ্বোধন-সম্পাদনার শুরুর দিকে নানা ত্রুটির কারণে বেশ অনেকক্ষণ ধরে 'স্বামীজীর ফায়ারিং' নীরবে হজমের পর ত্রিগুণাতীত মহারাজ বললেন—''ভাই, তোমার brain-টি কেমন! তোমার brain-টি আমায় দিতে পার?''

এই সরস মন্তব্যে হাসির রোল পড়ে গেল। অতঃপর ত্রিগুণাতীতানন্দ তাঁর জ্বরের কারণে সামান্য পথ্যিগ্রহণের হিসাব পেশ করলেন—সকালে একটু সাবু, দুপুরবেলা এক সের রাবড়ি, আধ সের কচুরি ও তদুপযুক্ত তরকারিমাত্র। একথা শুনে স্বামীজীর সাবাশী মন্তব্য, ''শালা! তোর stomach-টা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দিই।''

বকুনির প্রবল তাণ্ডব সুতরাং শেষ হল নির্মল হাস্যধারায়।

যাই হোক, এবার ত্রিগুণাতীতানন্দের পত্রকণিকার আলোকে কথাকণাগুলি স্পর্শ করে করে এই মজাদার মানুষটির মধ্যেকার মিষ্টি-মধুর রসবোধের নিখাত ফল্গুধারাটি খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ মানুষগুলিই ত্রিগুণাতীতানন্দজীর এই চারিত্রিক ঐশ্বর্যের ভাগীদার হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র শেঠ, অতুলকৃষ্ণ দাস প্রমুখ অন্যতম।

পূর্ণচন্দ্র শেঠ (১৮৭৪-১৯৩৬) ছিলেন স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদদের ঘনিষ্ঠ। তবে তাঁর বিশেষ সখ্য ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে। উদ্বোধন পত্রিকা যখন মাথাঘষা গলি থেকে মুদ্রিত হত তখন কাছাকাছি বড়বাজারে, ৩ বাঁশতলা স্ট্রিটে (বর্তমান স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট) পূর্ণবাবুর বাড়িতে আহার ও বিশ্রামের জন্য আসতেন উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ১৯০২ সালের নভেম্বরের প্রথমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমেরিকা-যাত্রা করেন। এই যাত্রাকাল থেকেই শুরু হয় পারস্পরিক পত্রবিনিময়। এইসব পত্র উভয়ের ঘনিষ্ঠ সহৃদয় বন্ধুত্বের পাশাপাশি মহারাজের কৌতুকপ্রিয়তা ও রসবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

পাশ্চাত্যের পথে রওনা দেওয়ার পর ৯ নভেম্বর ১৯০২ কলম্বো থেকে মহারাজ লিখছেন :

''প্রিয় পূর্ণবাবু—

...আগামী ১৫ই নভেম্বর জাহাজে উঠিব। জাহাজের নাম Bayern—তাহাতে করে জাপান পৌঁছিব ৫ই ডিসেম্বরে। পরে সেখান থেকে American Maru নামক জাহাজে ১৭ই ডিসেম্বর চড়ে ৩রা জানুয়ারীতে সানফ্রানসিসকোতে পৌঁছিব। তা হলেই এ যাত্রার নিশ্চিন্তি। তারপর সেখানে নেবে আবার আর একরকম পালা জুড়তে হবে। সে পালা যে এখন কেমন ধারা লইতে পারিব তা জানি

না; বোধ হয় সে পালা যে একবার শুনিবে, সে অমনি কানে আঙুল না দিয়ে দে টেনে দৌড় দেবে আর কি, দেখছি।"

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। মাথার উপর নিশ্চিত ছায়াপ্রদানকারী মহীরুহ অন্তর্হিত। পাশ্চাত্যের নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ। এই অনিশ্চয়তা নিয়ে মজাটা অবশ্যই করা চাই। এটাই প্রকৃত রসিকের লক্ষণ। উপরের অংশটির পরের অনুচ্ছেদে উদ্বোধনের সদ্য-প্রাক্তন সম্পাদকটি পূর্ণবাবুকে রসিকতার সুরে প্রশংসা করে লেখেন : ''আপনি নাকি উদ্বোধনে মাসিক ১০্ টাকা করে ঘুস দিতে ইচ্ছে করেছেন? ভাল! এ ভূত আবার ঘাড়ে চাপল কেন? কে চাপালে?"

অবশ্য কলম্বো পৌঁছনোর আগে ২২ অক্টোবর ১৯০২ মাদ্রাজ থেকে পূর্ণবাবুকে আর এক পত্র লেখা হয়েছে প্রাপ্তপত্রের উত্তরস্বরূপ। তাতে অবশ্য বোঝা যায় রসিকতায় কেউই কম যেতেন না—সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি আর কী!

''প্রিয় পূর্ণবাবু—

গত ১৫ই অক্টোবর তারিখের আপনার পত্র পাইয়া বড়ই খুসী হইলাম।... আর বাকি কি রেখেছেন?—নিজেকে অধম বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে; আমার কটাক্ষে সব হয় বলেছেন; আবার আমাকে কৃপা দৃষ্টি করিতেও অনুরোধ করেছেন; ইত্যাদি্ ;...

আমি অবশ্য আপনাদিগকে কখন ভুলিব বলিয়া বোধ হয় না। আপনারা যখন তখন সর্ব্বদাই আমাকে পত্র লিখবেন—আমার তাতে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে না, ভয় নেই।..."

এই পত্রের শেষে পরবর্তী গন্তব্যের হদিশ দেন। তবে ঠিকানা জানানোর আগে ছোট্ট মিঠে টিপ্পনী : ''এই পত্র পাইয়া যদি আমাকে লেখেন ত,

c/o R.S.Subramanium Esq.
Secy. Vivekananda Society
P.W.D., Colombo (Ceylon)"

অর্থাৎ 'যদি' লেখেন, তাহলে ঠিকানাটা প্রয়োজন হতে পারে।

১৯০৩ সালের ২ জানুয়ারি জাহাজ আমেরিকার সানফ্রানসিসকোতে পৌঁছয়। পূর্ণবাবুর পত্রের আশা করে মহারাজ আর ধৈর্য রাখতে না পেরে যেন একটু অভিমানভরেই ৪ মার্চ ১৯০৩-এ পত্র লেখেন। কী আশ্চর্য! সেই অভিমানেও মজার ছোঁয়া : ''প্রিয়তম পূর্ণবাবু—নাঃ আর চুপ কোরে থাকতে পারি নে। আমারই হার হয়েছে। আমিই না হয় আগেই পত্র লিখছি। আপনি বোধ হয় আমার সম্বন্ধে মনে করেছেন যে এখানে এসে আমি বড় লোক হয়েছি—আর বড় একটা পত্র টত্র লিখব না কারুকে; তাই মনে করে বুঝি পত্র টত্র আজও আমাকে লিখছেন না?..."

অবশ্য এমন দরদ-মাখানো রসময়-অভিযোগ অতি প্রিয় আপনার জনকেই করা যায়। কতটা প্রিয় ছিলেন পূর্ণবাবুরা? ওই চিঠিতেই ছোট্ট দুটো বাক্য—''আপনাদের ফটোগ্রাফদিগকে খুব কোসে আমেরিকা দেখাইতেছি। সমুদ্র খুব কোসে দেখাইয়াছিলাম। জাপানও দেখাইয়াছিলাম।" সুতরাং প্রিয়ত্ব বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যের বাহ্য-রীতিনীতি পালনের বাধ্যবাধকতার ঠেলায় অতিষ্ঠ ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁর সেই পাশ্চাত্যের প্রাথমিক জীবনযাপনের একটা বিবরণও দেন—খানিক বিরক্তিতে, রসিকতার ময়ান মাখিয়ে : ''এখানে আমাকে যার পর নাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।... প্রতি সপ্তাহে ৫।৭টা করিয়া বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। তা ছাড়া এখানকার রাজ্জির লোকের পত্রাদির জবাব দিতে হয়; এবং লোকজনের সঙ্গে ফেরত দেখাশোনা করতে যেতে হয়, ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে দেখা দিবার জন্য ঘরে হাজির থাকতে হয় ও তাদের সঙ্গে হুদো্

প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া আঠার বার আঠার রকমের পোষাক বদলাও।..."

নিরামিষ খাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। তাছাড়া ওইসময় জ্বরেও ভুগছিলেন তিনি। তবে জ্বরকে তিনি আবার সসম্মানে বলেন 'জ্বর মহাশয়' আর শরীর হল 'শরীর মহাশয়'। ৪ মার্চেরই পত্রে আরও লিখছেন : ''আমি সেই রকমই নিরামীষ আহারী আছি। মাছ মাংস ডিম বা চর্ব্বি আদৌ স্পর্শ পর্য্যন্তও করি না। চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। তার ওপর জ্বর মহাশয় প্রত্যহই পূর্ব্বেকার মতই আসতে আজও ভোলেন নি।" পত্রশেষে লেখেন—''সতীশবাবু ও সুরেনবাবু বোধ হয় এতদিনে আমাকে ভুলে গেছেন।"

চিঠি না পেয়ে অভিমান, আবার চিঠি পেয়ে আনন্দপ্রকাশেও রসিকতা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯০৩-এর পত্রে লেখেন : ''কি ভাগ্যি, এতদিন বাদে যে কত্তার মনে পড়ল!" অসুস্থ শরীর, তবু খাটুনিতে কমতি নেই : ''আমার শরীর পূর্ব্ববৎ। জানেন ত, মধ্যে্ আমার ঘাড়ে ভূত চাপে। সেই ভূত আমাকে এত খাটায়।" এরপর বন্ধুর কাছে খানিকটা যেন নিজের পিঠ চাপড়ানো, নিজের ঢাক নিজে বাজানো। তবে তাতে কাজের ভারটি খুব একটা লাঘব হয়নি নিশ্চয়ই—''দেখুন না, এখন রাত্রি প্রায় ১২টা, এখনও আর খান ১২ (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে) চিঠি লিখতে হবে।"

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ তারিখের পত্রে বন্ধুত্বের জোরে (১), (২), (৩) করে একগাদা জিনিসপত্র ও কাজের ফরমাস দিয়ে অবশেষে লেখেন : ''আর বেশী ফর্ম্মাজ এযাত্রায় পাঠাব না। আগে নমুনাটা দেখি। বেজার হন কি না? বেজার হবেন না বলেই বললুম।" এই অংশটি কৌতুকরসোচ্ছল ত্রিগুণাতীতানন্দজীর বন্ধুবৎসল পূর্ণবাবুর উপর ভারার্পণেরও এক অনন্য নজির। ১১ মে ১৯০৪-এর চিঠিটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর মজাদার মনোভাবের এক অভূতপূর্ব উদাহরণ :

''প্রিয় পূর্ণবাবু—

... ছয়খানি পুস্তক ও আর্শি পাইয়াছি। এ সকলের জন্য হৃদয়ের ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। সকলপ্রকার নোট্‌বুকও পাইয়াছি জানিবেন।...

লিখিয়াছেন পুস্তকাদির দাম দিতে হবে না; যখন আমি ফিরে যাব তখন বুঝিয়া লইবেন, এবং তার জন্য যেন আমি ভাবিত বা কিন্তু না হই। ভাল কথা; ভাবতে বারণ করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভাবনার চোদ্দপুরুষ টুকাইয়া [ঢুকাইয়া] দিয়াছেন; কেননা, ফিরে গেলে যে কি করে বসবেন তা ত জানি না! অত ভয় দেখালে যে মশাই ফিরে যাওয়াই মূলে হবে না! আর যদিও যাই, তখন এত ভারি হয়ে পড়ব, আর কি আমাকে বুঝতে বা 'বুঝে নিতে' পারবেন?

২য় কথা; লিখেছেন ''যত দ্রব্যের আবশ্যক হইবে আমাকে লিখিলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" বলি মশাই, এখন আমার, এই আপনাকে দরকার হয়েছে, ২য় নং সুরেনবাবুকে সপরিবার দরকার হয়ে পড়েছে, ৩য় নং—সতীশবাবুকেও চাই; ৪র্থ—শ্বশুরমশাইকেও যদি আনতে পারেন তো বড়ই ভাল হয়; আর তার সঙ্গে গিরীনবাবু প্রভৃতিকেও আনতে পারেন ত ক্ষতি নাই। এইসকল জিনিষ তার-যোগে পত্রপাঠ পাঠাইয়া দিবেন। কি যে না চাই মশাই তাত জানি না। হাদে—মা গঙ্গাকে পর্য্যন্ত আনতে পারেন—শাঁখ বাজিয়ে্? তা হলে একটা কায হয়।..."

পূর্ণবাবুকে লেখা ১৬ জুন ১৯০৪-এর পত্রেও সেই ফরমাস ও তার দাম দেওয়া নিয়ে রসিকতাপূর্ণ দড়ি টানাটানি চলছে :

''Zoology... Psychology পাইলে পাঠাবেন। Addyদের দোকানে পুরানোও নিদেন থাকিতে পারে। বড় বহি পাঠাবেন না।... যদি অনুগ্রহ করিয়া

দাম না লয়েন ত তার চেয়ে আর ভাল কি হইতে পারে—আমার মতন কৃপণের পক্ষে? কিন্তু মহাশয় গো আমি যাবার সময়ে রিক্ত হস্তে হয় ত যাব; আমার নিকট পয়সা কড়ি থাকে না যে, কিছু কিনে লইয়া যাইব। তখন মারলে বা কাটলেও কিছু পাবেন না। ভয় দেখাইবেন না মশাই, তাহলে আর ফিরে যাওয়া হবেই না হয়তো!

না মশাই,... হবেই না। না; ফিরে যাচ্ছিই...” এই পত্রের শেষে ত্রিগুণাতীতানন্দজী আবার পূর্ণবাবুর ‘আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী’! উভয়ের মধুর সম্পর্কের বাঁধনটা কী সুন্দরই না ফুটে উঠেছে!

আবার সুজন সুহৃদের পাঠানো ১৮ জুলাই ১৯০৪-এর পত্রে একান্তে গোচর হওয়ার মতো ও জনান্তিক রসিকতার গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করেন প্রিয় পূর্ণবাবুকে :

‘‘...আমি যে শারীরিক খুব ভাল তা নয়। তবে, কার্যে অপটু আজও হই নাই। হাসবেন না, ভালভাবেই লিখলাম। আমার চিঠি সকলকার সামনে পড়বেন না; আগে চুপিচুপি পড়ে তার পর চেঁচিয়ে পড়তে পারেন। জানেন ত আমি খেয়ুড় গেয়ে থাকি। বাচ্ছারা এখনও ছোট কি না, শুনেই ফিঁক করে হেসে ফেলবে। আপনার হৃদয় আমি জানি; আপনি যে আমার জন্য যার পর নাই কষ্ট করেন ও করছেন, তার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ধন্যবাদ না লয়েন, আশীর্ব্বাদ লেবেন্ তো; তাই দিতেছি গ্রহণ করুন।”

একটি পত্রে পূর্ণবাবুর কন্যার বিবাহ-সংবাদ পেয়ে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ লিখলেন : ‘‘আপনার মত ঝগড়াটে বিহাই [বেয়াই] অনেকে পেলে ‘বত্তে’ যাবে।... মঠ হইতে বিরজানন্দ স্বামী বোধহয় শীঘ্র আমেরিকায় আসিবেন। তাঁহার সঙ্গে বড়ি টড়ি, আচার টাচার প্রভৃতি যা যত পারেন পাঠাইয়া দিবেন অনুগ্রহ করিয়া।” অর্থাৎ যত রসিকতাই করুন না কেন, ভবি ভোলার নয়। বড়ি, আচারাদির ব্যাপারে তিনি ‘আশুতোষ’ হতে এক্কেবারেই রাজি নন।

পূর্ণবাবুর কাছে ফরমায়েশের আর শেষ নেই। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘর-গেরস্থালি, বড়ি, আচার, বইপত্তর, পূজার বাসনাদি ইত্যাদি ইত্যাদি যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, ২১ মে ১৯০৪-এ এক বি-ভীষণ ব্যতিক্রমী আবদার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে direct স্বদেশ ভারতবর্ষের কলকাতা শহরের ৩ বাঁশতলা স্ট্রিট, বড়বাজারের পূর্ণবাবুকে। এই ফরমাশকে কেন্দ্র করে কয়েকটি পত্রে যে-উপাখ্যানটি রচিত হয়েছে তাকে ‘অথ পাদুকা-সংবাদ’ নাম দেওয়া যেতে পারে।

‘‘প্রিয় পূর্ণবাবু—

ক্ষমা করিবেন, আবার এক ভীষণ ফরমাজ। আপনার মত যত্ন নইয়া [লইয়া] আর কেই বা এত আমার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিবে? সেইজন্যই আপনার নিকট এত আব্দার করি। এখানে... একজোড়া side spring (বা elastic) ওয়ালা ‘shoe’, খুঁজে্ পাইলাম না; এ দেশে সবই ‘বুট’। ‘শু’ পাওয়া যায়—সবই কেবল হন্টিং—সাইড্ স্প্রিং ওয়ালা পাওয়া যায় না। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইলাম। এখানে ফর্ম্মাজ দিলে হয়; কিন্তু দামে ৩০্।৪০্ টাকা এক ফর্ম্মাজী জুতায় পড়ে যায়। এখানে সব জুতাই কলে তোয়ের হয়—তাহার দাম সাধারণতঃ ১০।১২ টাকা মাত্র। (...জানি না) দেশী খুব ভাল মিস্ত্রি—লাল চাঁদ (বা লাখ চাঁদ, আমার ঠিক মনে নাই) বা যে চাঁদই হউক, কোনও এক উৎকৃষ্ট চাঁদের দোকান হইতে এক জোড়া shoe (boot নয়) অর্থাৎ এড়ি তোলা পায়ের গাঁট পর্য্যন্ত, আমার জন্য ফর্ম্মাজ দিয়া প্রস্তুত করাইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দর (বা যে স্বামী এখানে আসিতেছেন) মার্ফৎ [মারফত] পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।... যদি কোন স্বামীই না আসে তা হইলে ডাক-পার্শেলে বা জাহাজে কেবলমাত্র জুতা পাঠাইয়া দিবেন। কেবলমাত্র ‘হন্টিং’ জুতার ফিতা

আঁটিতে আমার অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হয়। স্প্রিং ওয়ালা হইলে অমনি ফশ্ করে পা'টা ঢুকাইয়া দিতে পারা যায়, আর জুতা পরতে দেরী হয় না।"

২২ মে ১৯০৪-এ আগের দিনের চিঠির শেষে যোগ করেন একটুকরো কাগজের কথা, বেশ মজার ভঙ্গিমায় : "এই অবশিষ্ট কাগজটুকু, গত কল্য যে চিঠি আপনার নামে পোস্ট করা হইয়াছিল, তাহার ভিতর যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল!!!"

উপরি-উক্ত চিঠিটি স্বামীজীর কাঙ্ক্ষিত 'কলকাত্তাইয়া' ভাষায় আদ্যোপান্ত লেখা।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৪-এর পত্রও পাদুকা-সংবাদে পূর্ণ :

"প্রিয় পূর্ণবাবু—

আপনার ৩ খানি পত্র (১৪ই জুলাইএর, ২৮ জুলাইএর ও ২৫শে আগস্টএর) পাইয়াছি। জুতা পৌঁছিলে একেবারে লিখব জেনে বুঝিয়া এতদিনে চেপে চুপে ছিলাম। জবাব দিই নাই, ক্ষমা করিবেন। আজ সন্ধ্যাকালে জুতা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। পঞ্চ টঙ্কা (প্রায় দুই ডলার) ডিউটী প্রভৃতি (অর্থাৎ কর্ত্তব্যের মাশুল) দিইয়া লইতে হইয়াছে। দেখিলাম জুতামহাশয়ের খোলোশের গায়ে প্রায় টাকা তিনেকের ডাক মাশুল। মন্দ নয়! ভাবুন একবার, যখন আমাদের একজোড়া জুতামহাশয়ের বিলাতে আসিতে এত টাকা খরচ, তখন স্বয়ং—কর্ত্তা মহাশয়দের আসিতে কত বেশী খরচ হওয়া সম্ভব!

আপনি লিখিয়াছেন—"আপনাকে দাম দিতে হইবে না, সেজন্য ভয় করিবেন না। আপনি শীঘ্র ফিরিয়া আসুন, কোন ভয় নাই। কেহ একবারও দাম চাহিবেন না।" নাঃ মশাই! আমার ত বিশ্বাস হয় না। দাম চাবেন না বটে বিশ্বাস করি; কিন্তু আমি দামের কথা উল্লেখ করিছি বলেই আপনারা খোঁটা দিয়ে... ছাড়বেন—আমি দিব্য চক্ষে দেখছি; হাদে নিদেন ত আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌বেন ত?

নবাব জুতামহাশয়, স্ত্রী-পুরুষেই (অর্থাৎ দুপদেই) অতীব সুন্দর হইয়াছে। এত ভাল হবে আশা করি নাই। পায়ে ঠিক হইয়াছে। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। সেই জুতো পরিয়াই এই চিঠি লিখছি। সেই জন্যে এত লম্বা চিঠি লিখতে পারছি। রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, তবু এখনও চক্ষে ঘুম আসে নাই। এত কষ্ট দিয়াছি কিছু মনে করিবেন না। কিছু মনে করেন না, ও গালমন্দ দেন না বলিয়াই ত, এত কষ্ট দি।"

নতুন জুতো পায়ে দেওয়ার আনন্দ যে লম্বা চিঠি লেখার সহায়ক—এ-যুক্তিতে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব আছে বটে! এই পত্রেরই শেষাংশে আবার এক জমজমাটি মজার মন্তব্য : "...আমার উদ্বন্ধন বেশ চলছে শুনে সুখী হইলাম। কিন্তু আমি আর গলা তাতে দিচ্ছি না। উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করতে রোয়ে গেছি। শুদ্ধানন্দ সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজ করেন, অমনধারা দশটা উদ্বন্ধন এলেও, তার... ফাঁসি লাগাতে পারবে না।"

১১ অক্টোবর ১৯০৪-এর পত্রে পুনরায় পাদুকা-সংবাদ :

"প্রিয় পূর্ণবাবু—

...জুতামহাশয় বেশ চলছেন। তাহার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।... আমি আজকাল খুব ভাল আছি। কেবল খেটে জান হায়রান হইল। না খেটে থাকতে পারা যায় না। মতীলাল মহারাজ শীঘ্র না আসিলে বোধ হয় আর আমার হাড় কখানা খুঁজে পাওয়া ভার হবে।" এই পত্রেই মোটামুটিভাবে পাদুকা-সংবাদের পরিসমাপ্তি।

১৮ জানুয়ারি ১৯০৬-এর পত্রে ধার চাওয়ার এক অভিনব পদ্ধতি প্রকাশিত হল :

"প্রিয় পূর্ণবাবু—

আপনার দ্বারে আজ এক জন ভিক্ষুক উপস্থিত। ভিক্ষা চাই। দেবেন কি? কি রকম ভিক্ষা, বলিতেছি শ্রবণ করুন।—

কালীকৃষ্ণ মহারাজ আসতে পারলেন না, হরিপদ

মহারাজ আসছেন। তাঁর পাথেয় পাঠাইয়াছি। পরে, এক্ষণে আরও এক জনের আবশ্যক হইয়াছে। বোধ হয় বসন্ত মহারাজ আসবেন। ইঁহার পাথেয় উপস্থিত পাঠাতে পারিলাম না, কিন্তু ঐ দুই জন লোককে এখনই চাই। মাস চারেকের মধ্যেই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। আপাততঃ মহাশয়, আপনি যদি আপনার 'পূর্ণ ভাণ্ডার' হইতে আমাকে ৬০০্ ছয়শত টাকা (যত সুদ লাগে, তত সুদে) ধার দেন ত বড়ই উপকৃত ও বাধিত হই। এই ভিক্ষাটী দেবেন না কি?—না, ফিরে যাব?... আমি আপনাকে ওই ছয়শত টাকা সুদ সমেত চারি মাসের মধ্যে পাঠাইয়া দিব।

সাচি ও ভাজা সোনা মুগের ডাল, খাড়ি সোনা মুগ, খাড়ি মুশুর, অপরাপর ডাল, বড়ি, পাঁপর, আচার, ইত্যাদি্ অনুগ্রহ করে পাঠাবেন।"

লক্ষণীয়, টাকা ধার চেয়েছেন বলে মুদি-দোকানের ফরমায়েশি ফর্দখানা পাঠাতে ভোলেননি।

তবে এই অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ দেখে আমরা বেশ মজা পেলেও কেন জানি না মনের অন্তস্থলে একটা রিনরিনে ব্যথা বেজে ওঠে। প্রাণারাম শ্রীরামকৃষ্ণ চলে গেছেন, প্রাণসখা স্বামীজীও; আর তাঁদের ইচ্ছা, আদেশগুলিকে রূপ দিতে মানুষগুলোর কী আর্তি, কী আকুতি, কীরকম আত্মনিবেদন!

কলকাতার বহুবাজারের ১২ সার্পেন্টাইন লেন-এর বাসিন্দা অতুলকৃষ্ণ দাস ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর কাছে লেখা কয়েকটি চিঠির মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে ত্রিগুণাতীত মহারাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার গভীরতা ও মহারাজের স্বভাবগত কৌতুকপ্রিয়তা।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০-এর পত্র শুরু হল "শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণ-কমলেষু—" সম্বোধনে। তারপর : "প্রিয় অতুলকৃষ্ণ—কিছু মনে করিও না, উপরে পত্র-পাঠটা কেমন লিখেছি বলে। কেমন একটু তোমার সঙ্গে রগড় করতে ইচ্ছে হইল, তাই আর কি।"

অতুলকৃষ্ণের প্রকৃত পদবি 'দাস'। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে দ্বিজত্ব দান করতে চেয়েছিলেন বোধহয়। দূর প্রবাসে বসে স্বদেশে বন্ধুসঙ্গে কাটানো হাসি-রসময় দিনগুলির অতীতস্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট করে : "শুঁড়ির দোকান থেকে তোমাকে দিয়ে কেমন মাংসের কচুরি আনিয়ে খেতুম, মনে আছে কি?" ওই চিঠিতেই আবার মজা করে সহৃদয় সুহৃদদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা : "... যখনই আমাকে চিঠি লিখবে, যাবতীয় ভক্তবৃন্দের নাম করিয়া্ (টিক্‌টিকেটা—চামচিকেটা থেকে আরম্ভ করে পূজনীয় গিরিশ ঘোষ পর্য্যন্ত) সকলের কথা যতদূর জানো খবর দিবে। আর, কর্ত্তা মশাই, আমি লাখপতিও হই নি, শত-পতিও হই নি; এর মধ্যে যে, তোমরা চিঠি যদি ১খানা লিখি ত তার দরুন... পয়সা কেটে নিতে আরম্ভ করেছ। ভাই রে, শেষকালে সাধুসেবা ভুলে যাবে নাকি। বলি, যখন দ্যাশে ফিরে যাব, তখন ট্রাম ভাড়াটা পর্য্যন্তও দেবে না, এবং পার ত কেটে নেবে। বলি নাগপুরে আছি বলে, মণ্ডাটা আশটা যদি না ছুঁড়ে দিতে পার ত, ডাকের ১খানা টিকিট ত চালান করতে পার। দেখেছ, একবারে কত লিখে ফেললুম। টড্‌স্ রাজস্থান এখানে কুশলে পৌঁছিয়াছেন। টাকা ফুরিয়ে যাবার ৪ মাস আগে থাকতে আমাকে তাগিদ দিও। নচেৎ তোমাকে আণ্ডড়ি দিতে হবে কর্ত্তা। দাসের নমস্কারাদি জানিও। ইতি ত্রি."

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ সালের চিঠিটি প্রকৃতপক্ষে অতুলকৃষ্ণের কাছে লেখা হলেও তা পূর্ণবাবুর সঙ্গে মস্করারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

"প্রিয় অতুলকৃষ্ণ,

...আজকেকার ডাকে তোমার নামে একটা লম্বা 'রোল্' করা প্যাকেজে, একখানি কাগজে আঁকা পূর্ণ শেঠের নিজের ছবি পাঠালাম। পূর্ণ শেঠকে আমি নুকিয়ে [লুকিয়ে] পাঠাচ্ছি, যাতে তিনি না জানতে পারেন যে—কে পাঠিয়েছে। অতএব, তুমি আস্তে ওপরকার কাগজের 'র‍্যাপারটী' সব ছাড়িয়ে ফেলবে; দেখ যেন পীচ-বোর্ডের গেনাপুট্টী না ছিঁড়ে যায়; ওপরকার কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললেই দেখবে যে ভিতরে (অর্থাৎ ঐ পেষ্ট বোর্ডের ওপরে) পূর্ণ শেঠের এড্রেস লেখা আছে। তুমি ওই রোলটীর ঢাকনি (যাহা শেলাই করা আছে) খুলো না; এবং কোথা থেকে ও কে পাঠাচ্ছে কিছুই লিখ না, না লিখে অমনি ডাকঘরে বুক পোস্টে বা পার্শেল পোস্টের টিকিট মেরে ডাকে ফেলে দেবে। টিকিটের পয়সা, আমার পয়সা থেকে লইবে।"

রহস্যপ্রিয়তা ত্রিগুণাতীত মহারাজের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য। তাঁর পত্র-নির্দেশিত plan অনুযায়ী ব্যাপারটা ঘটলে কেমন মজাটাই না হবে, পূর্ণবাবুর বিস্ময়াবিষ্ট হতচকিত ভাব ইত্যাদি দৃশ্যাবলির কথা ভেবে ত্রিগুণাতীত মহারাজ নিশ্চয়ই বালকসুলভ উচ্ছলতায় নিজেই মশগুল হয়েছিলেন! পাশ্চাত্যের গুরুগম্ভীর নিয়মনিষ্ঠ, কঠিন কঠোর সত্যনিষ্ঠ আচার্যটি যে এমন রস-রসিকতারও সক্রিয় কর্তা, পাশ্চাত্যের কেই বা অনুমান করতে পারত? তবে রস-রসিকতা নামক স্বতঃপ্রকাশ গুণটিকে ঢেকেচেপে রাখা বড়ই কঠিন।

যাহোক, পাশ্চাত্যের কেউ কেউ যে ত্রিগুণাতীত মহারাজের ওই রসপ্রসাদে বঞ্চিত হননি, তার পরিচয় কিছু পত্রে পেয়ে থাকি। যেমন—অ্যালেন দম্পতি। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য সফরকালে তাঁর সান্নিধ্যে আসা টম অ্যালেন ও এডিথ অ্যালেন। স্বামীজীর বিভিন্ন কাজে সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। মিসেস অ্যালেন স্বামীজীর স্নেহময় পিতৃসত্তায় অভিভূত হন ও তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকার অনুমতি লাভ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁদের নাম দেন—'অজয়' ও 'বিরজা' আর তাঁদের মন্ত্রদীক্ষা হয় ত্রিগুণাতীতানন্দজীর কাছে। এঁদের সঙ্গেও ত্রিগুণাতীতানন্দজীর ছিল বড়ই ভালবাসা ও মজার এক সম্পর্ক।

১২ জানুয়ারি ১৯১০-এর পত্রে শব্দ নিয়ে এক মজার লেখা :

"[Dear Mr. Allan,]

...অন্যজন কেমন আছে? আমি আশা করেছিলাম, গত রবিবার আমার সঙ্গে দেখা করে 'অন্যজন'-এর সংবাদ দেবে। আশা করি, অন্যজন খুব ভালই আছে। অবশ্য সেইসঙ্গে তুমিও—ঐ 'অন্যজনের' 'অন্যজন'।"

কথা নিয়ে, শব্দ নিয়ে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের মিষ্টতাটুকু নিয়ে এই যে শব্দবিন্যাসের মজার খেলা, তা অত্যুচ্চ রসবোধেরই পরিচায়ক।

এরপর মিস্টার আর্নেস্ট ব্রাউন (সজ্জন)-এর কথা। মি. ব্রাউন ছিলেন সানফ্রানসিসকো বেদান্ত-কেন্দ্রের অন্যতম সদস্য। তাঁর সঙ্গে ত্রিগুণাতীত মহারাজের ছিল এক ভারি মজার সম্পর্ক। একবারের কথা। মি. ব্রাউন নিশ্চয় কাজের মানুষ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অফিসের জিনিসপত্র গোছানোর দায়ভার নিজের কাঁধে নিজেই টেনে নিয়ে তাঁর বড়ই উপকার করতে চেয়েছিলেন—মানে, কাজ এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর কী! কিন্তু বিধি বাম। প্রশংসার বদলে জুটল ধমকানি। ২৮ মে ১৯১২-র পত্রে এক বজ্রপাত :

"মিঃ ব্রাউন। আমাকে আপনি বলুন তো, আমি কি আপনাকে জানাই নি যে, কোন জিনিস এখান থেকে ওখানে সরাবেন না, বা সেই জিনিসগুলোকে অন্যত্র অপসারণ করবেন না?

বলুন দেখি, আমার বিরক্তির কারণ ঘটিয়ে আপনি আবার ও-কাজ কেন করলেন?

সুতরাং, মি. ব্রাউন, আমাকে ক্ষমা করবেন এবং

দয়া করে আর আমার অফিস পরিষ্কার করতে আসবেন না। আপনি অতীতে আমার যে সেবা করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

ডোজটা সেইবার কতটা কড়া হয়েছিল কে জানে! তবে পরে ৩ জুলাই ১৯১৪-তে পুনরায় কোনও কারণে অভিমানান্বিত আর্নেস্ট ব্রাদারকে লেখা এক মজার অনুনয়পত্র :

"My dear Earnest Brother!!

এটা তোমায় ঘরে ফেরানোর আহ্বানপত্র। আমি তোমার অভাব খুবই অনুভব করছি। কেউই এটা বিশ্বাস করবে না, আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য এই গুজব ছড়িয়েছিলাম যে, 'শেষ পর্যন্ত মি. ব্রাউনও আমাকে ছেড়ে চলে গেল!'—এসব ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়? আমি আজকাল অনুভব করছি, যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

তোমার সমস্ত চিঠির জন্য তোমায় ধন্যবাদ। তোমার প্রথম তিনদিনের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার জন্যও ধন্যবাদ—যা কখনই আমি ভুলব না এবং ক্ষমাও করতে পারব না।

Who is it?"

যাইহোক, 'who is it?'-টি কে বুঝতে নিশ্চয়ই ভুল করেননি মহারাজের সঙ্গলাভে সৌভাগ্যবান আর্নেস্ট ব্রাউন। অনুমান করি, মান-অভিমানের পালা সেবারের মতো সাঙ্গ হয়েছিল।

যাক, এবার আবার পুরনো বন্ধুবর অতুলকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পাশ্চাত্যের শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে পত্রোত্তর পাঠাতে বড়ই বিলম্ব হয়ে যায় ত্রিগুণাতীতানন্দজীর। নিশ্চয়ই সে-বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে চিঠিও আসে। অভিযোগ ও ছদ্মরোষের 'হেঙ্গামা' এড়াতে তুরন্ত-জবাব পাঠান কখনও-সখনও। তেমন এক চিঠি সানফ্রানসিসকো থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০-এ লেখা :

"প্রিয় অতুলকৃষ্ণ—

এবারে আর হেঙ্গামা করতে পারবে না যে, আমি তোমাকে শীঘ্র্ জবাব দি না। এই চিঠি (চিঠির উপর চিঠি) তাহার প্রমাণ। মনে রেখো। যদি ভবিষ্যতে দেরী হয় ত এই বারকারের দৃষ্টান্তটা মনে করে সান্ত্বনা লাভ করিও।"

দেশ থেকে নানান প্রয়োজনীয় রসদ ও ফরমায়েশি জিনিসপত্র পাঠান অতুলকৃষ্ণ। সেসবের হিসাব রাখা নিয়েও ওই পত্রেই রসিকতা চলে : "...আমার যাবতীয় হিসাব ১ খানা পুরুখাতা করে (ঘরে, হাতে বাঁধা, যেন দোকান থেকে কিনতে না হয়। দপ্তরী পাড়া থেকে শস্তার কাগজ কিনে ঘরে হাতে বেঁধে নেবে দাদা) তাতে সেই মান্ধাতার আমল থেকে আমার যাবতীয় হিসাব টুকে রাখবে। মায়—পূর্ণ মাসী চোত্-সংক্রান্তিতে যে ছাতু খেয়েছিলেন, তা পর্য্যন্তও টুকবে। আমি জিজ্ঞাসা করলে অমনি ফট্ করে সব বলে ফেলবে।"

ত্রিগুণাতীতানন্দের প্রয়োজন একটা Customs Duty-র তালিকা বহি। তবে এই বস্তুটি সংগ্রহের জন্য খরচ-খরচা বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করেন তিনি। তাই উক্ত ২৪.৯.১৯১০-এর পত্রে সংযোজন করেন সাবধান-নামা :

"কলিকাতা Customs Dutyর তালিকা বহি ১ খানা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাও ত বাধিত হইব। দেখ, দাদা যেন কিনে না পাঠাতে হয়! চেয়ে লইবে। না হয় ত দাদা হাতে লিখে copy করে পাঠাবে। ইতি বশম্বদ ত্রিঃ—।" কে কার 'বশম্বদ' কে জানে!! তবে এত রস-রসিকতাতে যে পত্রপ্রাপক তার হাসিটি লুকোতে পারবে না, সেটা বুঝে বন্ধুসুলভ মিঠে-শাসানির কড়কানি : "চিঠি পড়ে অত হেসো না কত্তা!!"

এরপরে উল্লেখ করা যাক ভাব ও ভাষাসমৃদ্ধ ২৩ ডিসেম্বর ১৯১০-এর পত্রটি। উক্ত পত্রটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার—

"প্রিয় অতুলকৃষ্ণ,

তোমার গত আগস্ট ১১ই-র পোস্টকার্ড যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আজ তার জবাব দিচ্ছি! তোমাদের মতে আজ প্রায় ৪ মাস পরে জবাব দিচ্ছি; কাযেকাযেই তোমরা বলবে বইকি যে, আমি এত দেরিতে জবাব দি কেন? জান না ত যে, আমি দেবলোকে বাস করিতেছি। তোমাদের মনুষ্যলোকের মতে ৪ মাস সত্য বটে, কিন্তু আমি যে লোকে বাস করিতেছি সেই দেবলোকের মতে কেবল ৪ দিন মাত্র জানিবে। এখানে কেবল সব দেবতা বাস করেন। এখানে ১২ মাসই মলয় পবন বহে; শোক তাপ, সুখ দুঃখ এখানে স্থান পায় না। আধি ব্যাধি, জরা মৃত্যু দূরে পলায়ন করে। বৃদ্ধ যুবা হয়; বোবা কথা কয়; এবং পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। তার সাক্ষি আমাতে দেখ। বেশীদূরে যেতে হবে না। প্রায় ৫০ বছর বয়স হতে চলিল, এখনও যুবার চৌদ্দপুরুষের মত খাটিতেছি। সকল ডাক্তারে বলিল মরিবার আর ১ মাস মাত্র বাকি... আর দেখ না, এই আট বছর হয়ে গেল, এখন বেঁচে আছি। কোথায় এক গোপণ্ডিত গর্দ্ধবের মত ছিলুম, আর দেখ না এখানে দেবলোকে এসেই দেবাচার্য্য হয়ে গেলুম। এসব কেমন করে হল জান?—দেবলোকে আসা প্রভৃতি?—সবই সেই ঠাকুরের কৃপায় জানিবেন।—এই...। ঠিক নয় কি?—বল, তোমরাই বল। সত্য কি মিথ্যে!"

হ্যাঁ, ঠাকুর—ঠাকুরই ছিলেন এঁদের জীবনের ধ্রুবতারা, এঁদের হৃদয়ের পরম ধন। এঁদের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি ভাব-চিন্তা, প্রতিটি প্রাণস্পন্দন তাঁরই জন্য, তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত। তাই কম্পাসের কাঁটাটি স্থির থাকে সেই একটি বিন্দুতেই। তাঁদের কর্মব্যস্ততায় তিনি, ক্ষণিকের বিরতিতেও তিনি, দুঃখে তিনি, সুখেও তিনি, ব্যথার ব্যথী তিনি, ব্যথানাশেও তিনি, হাসিতে-মজাতে-ফাজলামিতেও তিনি। তিনিই তাঁদের চিরসখা। সেই চিরসখাকে নিয়ে মজা-রসিকতার এক ছোট্ট নমুনা—যা কিনা শাস্ত্রেও অত্যুচ্চ শরণাগতিরই পরিচায়ক—সেই পত্রাংশ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করা যাক। এ-পত্রটি ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারিতে পূর্ণবাবুকে লেখা।

১৯০৩ থেকে ১৯১২। সুদীর্ঘকাল প্রবাসে অতিবাহিত হয়েছে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও 'মানুষ' ত্রিগুণাতীতানন্দজীর কাছে স্বদেশের স্বজনদের কাছ থেকে কখনও কখনও আর্জি আসে অন্তত কিছুদিনের জন্যও স্বদেশে ফেরার। তার উত্তরে ঠাকুরের সন্তান নিরুপায় হয়ে লেখেন :

"...দেশে ফিরে যাবার হাত খোদার হাতে, আমার হাতে নয় মশাই। আমি অনেক বার চেষ্টা করেও হয়নি। স্বার্থ বাসনা—ছেড়ে দিবার চেষ্টা করছি; ঠাকুরের উপর নির্ভর করে যাতে সাধুগিরি বজায় রেখে চলতে পারি তারি চেষ্টা করছি। মশাই বলতে কি—ঠাকুর আমার সঙ্গে রীতি মত জুয়াচুরী করতে আরম্ভ করেছেন। জানেন ত মশাই—তার সঙ্গে বধমায়েশী [বদমায়েশি] করে পার পাবার জো নাই। ক্রমাগত কাযের উপর কায আমার উপর যত পারেন চাপিয়ে দিচ্ছেন। যেই একটা কাযের দায়িত্ব ফুরুবে্ হয়ে আসছে, আর আমি মনে করছি যে এই বারে আর কি—অমনি একবার দেশ থেকে হয়ে আসব—অমনিই ঝাঁত করে এমন ফিকির করে আর একটা বড় কাযের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন। কর্ত্তব্যের খাতিরে আমি অমনি ঘাড় পেতে দি! এইরকম করে খোদা বোধ হয় আমাকে এখন আবার আর এক ১০ বছরের কায ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। শারীরিক খারাপ থাকলেও মশাই বলবার জো নাই; অমনি চাবুক হাঁকাবেন; কাযে কাযেই আজকাল সর্ব্বদাই বলে থাকি যে আমি ভাল আছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের ভাল থাকা, মন্দ থাকা, তাঁদের সুখ, তাঁদের দুঃখ, তাঁদের জীবন, তাঁদের মরণ সেই—সেই সখাতেই নিবেদিত। তাঁরা যে ঠাকুরেরই। তাঁরা যে ঠাকুরের ভালবাসায় ক্রীত—চিরদিনের চিরকালের জন্ম-জন্মান্তরের ক্রীতদাস।